The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 105-124
ISSN 2306-3920

জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মে স্বদেশ ও সমকাল : একটি সমীক্ষা

তরুন কুমার সরকার*
রণজিৎ মল্লিক**

[**সার-সংক্ষেপ :** শিল্পীর কোনো দেশ নেই- এমন কথা শিল্পের সর্বজনীন ভাবাদর্শ-দর্শনের আপ্তবাক্য হিসেবে উচ্চারিত হলেও একথা অস্বীকার করা যায়না যে সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পীও ভৌগোলিক-স্থানিক পরিচয়ের বাইরে নন। কেননা মানুষ হিসেবে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা একটি সুনির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যেই ঘটে থাকে। আর প্রত্যেক মানুষের জীবনই কোনো একটি কালের পরিধিতে আবদ্ধ। তবে মানুষ তার মেধা ও মননের উৎকর্ষ-বিকাশের ভেতর দিয়ে ছাড়িয়ে যান স্থানিকতার সীমা, ছাপিয়ে যান সময়ের গন্ডি। তবে স্বদেশ ও সমকালকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সেসবকে ধারণ করেই তিনি হয়ে ওঠেন সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন। কেননা শিল্পীর মৌল পরিচয় যে মানুষ তার মূল শেকড়টি গ্রথিত থাকে স্বদেশ ও স্বকালের সমাজ-সংস্কৃতি-ভূগোলেরই গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কাজের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য তার স্বদেশ ও সমকাল সংলগ্নতা। ভারতীয় উপমহাদেশীয় তথা বঙ্গীয় ও বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তিনি এক অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্ব। কেননা তিনি স্বদেশীয় শিল্প ঐতিহ্য ধারায় নিজেকে কেবল সম্পৃক্ত করেই আত্মসিদ্ধি লাভের উপায় খুঁজেননি, তিনি সে ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তার সৃজন-কল্পনার স্বকীয়তায়। রাষ্ট্র গড়ে রাষ্ট্র ভেঙেছে, রাজনীতির নানান দ্বন্দ্বমূখর স্রোত-সমীকরণ সমাজস্থ মানুষকে নানানভাবে বিভক্ত করেছে; কখনো সম্প্রদায়ের নিরিখে, কখনো বা ভূগোলের চিহ্নায়নে। কখনো বা মানুষের বিপন্নতাকে বাড়িয়ে দিতে শাসকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রকৃতির বৈরিতা। এসব কিছুই সুগভীর মানবিক অনুভববেদ্যতার সঙ্গে স্পর্শ করেছে শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে। জন্মেছিলেন তিনি অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গেঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। শিক্ষালাভ করেছেন বৃটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতায়। জন্মকালীন পরিচয়ে তিনি ভারতীয় বাঙালি; শিল্প সাধানার ক্ষেত্রে তিনি সে ঐতিহ্যকে গ্রহণও করেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই জয়নুল বাঙালি শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাতে নতুনত্ব যোগ করেন। যে বৃহত্তর ভৌগোলিক সমাজ-সংস্কৃতির তিনি উত্তরসূরী সেখানে যেমন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গীয় কলকাতা তেমনি রয়েছে পূর্ববঙ্গ। তাই শৈল্পিক সৃজন-কল্পনার ধ্রুপদী রূপায়নে তিনি উভয়বঙ্গীয় যাকে ভূগোল নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে লোকায়ত বলে।

কলকাতাকেন্দ্রিক ভারতীয় তথা বঙ্গীয় চিত্রকলা-ঐতিহ্যের প্রথিতযশা ও প্রবাদপ্রতীম পুরোধাব্যক্তিত্ব অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ

* **তরুন কুমার সরকার :** সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **E-mail** : tarunsarker@juniv.edu

** **রণজিৎ মল্লিক** : সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, সরকারী ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল।

শিল্পীদের প্রভাবাধীনে থেকে জয়নুল আবেদিন শিক্ষা লাভ করেছেন। সে ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটাবার একটি প্রয়াস প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক ভারতীয় তথা বঙ্গীয় শিল্প ঐতিহ্যের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক জীবন ও বোধ ঘেষা। ইউরোপীয় আধুনিকতা প্রভাবিত সে শিল্প-ঐতিহ্যধারায় জয়নুল আবেদিন যোজনা করেন বঙ্গীয় লোকায়ত জীবন প্রভাবিত নতুন ধারা। সে ধারার উৎসভূমি এই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ। তাঁর কলাচিন্তার ভরকেন্দ্র বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার গ্রামীন সমাজ ও খেটে খাওয়া মানুষ। অতিকল্পনা ও রোম্যান্টিক অনুধ্যানের পরিবর্তে তিনি আকৃষ্ট হলেন 'বাস্তব জীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়নে"(মনসুর, ২০১৩:১৯)। এর সবচেয়ে প্রজ্জ্বল প্রমাণ কলকাতা পর্বে (১৯৩৩-১৯৪৭) তার আঁকা দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা।

জয়নুল আবেদিন তাঁর সমকালের একজন মানবিক প্রত্যক্ষদর্শী। তার ছবির মূখ্য বিষয় মানুষ। বিশেষত প্রান্তিক ও বিপন্ন মানুষ। তাঁর ছবি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের সাক্ষ্য ও বয়ান। কখনো আবার তা সংস্কৃতির আখ্যান। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো রাজনৈতিক দল ও মতের ঘোষিত সমর্থক-অনুসারী না হয়েও প্রকৃত শিল্পীর সর্বমানবিক উপলব্ধিতে তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক। ব্যক্তির নয়, সমষ্টির উন্নতি-অগ্রগতিই ছিল তার শিল্পাদর্শের মৌল উদ্দিষ্ট। তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার বিষয় ও প্রকরনের ভেতর দিয়ে যেমন তাঁর হৃদয়বাদী মানবিক সত্ত্বার পরিচয় মেলে তেমনি তা তাঁর শেকড়সংলগ্নতারও চিহ্নায়ক। ভূরাজনৈতিক বিক্ষেপের ফলে জয়নুল ১৯৪৮-এ নাগরিকত্ব সূত্রে ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের বাসিন্দা হলেও তার মানসচেতনায় বহমান থাকে বাঙালির সংস্কৃতিভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত জীবনের ধারণা। আর সে ধারণার মূল ভিত্তি এই পূর্ববঙ্গ-বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসের নানা বাঁকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্মিলিত স্রোতধারার সঙ্গে একাত্ম থেকে শিল্প সৃজনে ব্রতী হয়েছেন। ১৯৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আঁকা তাঁর নবান্ন, ১৯৭০-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্নিঝরের প্রেক্ষিতে আঁকা *মনপুরা-৭০*, এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জয়নুলকৃত ড্রইং *বীর মুক্তিযোদ্ধা* তার স্বদেশ ও সমকাল চেতনার স্বাক্ষ্য বহন করে।]

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

বর্তমান বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে জয়নুল আবেদিন কেবল সময়ের বিচারে অগ্রগণ্য নন, এই ভূখন্ডে তিনি চারুশিল্পচর্চার পথিকৃৎ (মনসুর, প্রস্তাবনা)। শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বদেশ ও স্বকালকে আশ্রয় করেই তিনি গড়ে তোলেন তার শিল্পভুবন, হয়ে ওঠেন একই সঙ্গে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক। উত্তর-ঔপনিবেশিক ও বিশ্বায়নের এই সময়ে জয়নুলকে আরো গভীরভাবে জানা তাই আমাদের সকলের জন্যেই জরুরী। মানুষের মহত্ব যে কেবল প্রতিভা দিয়ে প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা, সঙ্গে দরকার মানবিক দায়বোধ- জয়নুল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শিল্পী ও স্বদেশ : জয়নুল আবেদিনের অভীপ্সা ও অন্বেষা :

মানুষের প্রকৃত স্বদেশ যদি হয় তার ভাষা তাহলে শিল্পীর জন্য সেই স্বদেশের ধারণা ও বাস্তবতার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে যুক্ত হয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। ভাষা-দেশ-কাল এই ত্রিবিধ প্রপঞ্চের সমন্বয় ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা প্রকৃত শিল্পীর গৃহ এবং গন্তব্য রচনা করে। স্বদেশ ও সমকালকে আশ্রয় করেই ঘটে তার উন্মেষ ও বিকাশ। তবে এর জন্য ভেতরের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে প্রয়োজন হয় সচেতন প্রবনতা। বাংলার, তথা উপমহাদেশীয় শিল্পের ইতিহাসে জয়নুল আবেদিন এক অনন্য ও অদ্বিতীয় শিল্প প্রতিভা

যার সৃজনকর্মের ভেতর দিয়ে মূলত স্বদেশ অন্বেষার এক নতুন পদ্ধতি ও পর্ব রচিত হয়। শিল্পীর জাত বিচারে জয়নুল নিঃসন্দেহে জাত শিল্পী, অর্থাৎ শিল্পের একটি সহজাত প্রতিভা নিয়েই তাঁর জন্ম। কিন্তু কেবল প্রতিভাই প্রকৃত শিল্পীর জন্য সব বা শেষ কথা নয়, কেননা শেকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিভাও অপচিত হতে পারে নিছক বাগাড়ম্বরে অথবা তা ব্যর্থ হতে পারে চূড়ান্ত প্রকাশ ও বিকাশ স্পর্শ করতে। শেকড় বিচ্ছিন্নতার সংকট মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সে উপলব্ধি তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির কাছে। না জয়নুল মাইকেল নন, দুজনের ভেতর পার্থক্য রয়েছে অনেক রকম, দুজনের সৃজন-প্রতিভার ক্ষেত্রও ভিন্ন। সময়ের ব্যবধান ছাড়াও শিল্পের সম্পূর্ণ আলাদা দুই ভুবনের এই দুই প্রতিভার মধ্যে ছিল ধর্ম-সম্প্রদায়গত এবং সামাজিক ও শ্রেণিগত পার্থক্যও। তবে যে মিলের কারণে চিত্রশিল্পীর আলোচনায় ভাষাশিল্পী প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন তা তাদের বিদ্রোহ। সেই দ্রোহ কেবল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বা বিদ্যমান ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নয়, তা একই সঙ্গে নিজের সঙ্গেও বোঝাপড়ার এক পদ্ধতি। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারের আশা ছিল সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি চাকুরি করবেন। পারিবারিক কৃষি ঐতিহ্য ছেড়ে পিতা প্রথম চাকুরে হয়েছিলেন, পুলিশের নিম্ন পদে। সেকালের কোনো পিতা-মাতাই চাইতেননা, আজো সাধারণত চাননা সন্তান ছবি আঁকার মতো অনিশ্চিত পেশায় ক্যারিয়ার গড়ুক। জয়নুলের পক্ষে পিতার পথে যাওয়াটাই হতো স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন দ্রোহের পথ (আহমেদ ও বড়ুয়া, ২০১৬:১৪৪)। দ্রোহের লক্ষ্য দ্বিবিধ স্বীয় সত্ত্বাকে সৃজন-বিনির্মাণের ভেতর দিয়ে স্বদেশকে উপলব্ধি ও অন্বেষণ এবং এই অন্বেষা ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে আপন সত্ত্বার আবিষ্কার, প্রকাশ ও বিকাশ।

আবেদিনের শিল্পকর্ম বুঝতে বা তাঁর স্বদেশ অন্বেষার ধরণ অনুধাবন করতে হলে চোখ ফেরাতে হবে তাঁর সমকালের পানে, বুঝতে হবে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জন্ম তাঁর বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভারতীয় বাংলায় কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশকে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে। সে বাংলারও বিশেষত্ব রয়েছে কেননা যে পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁর উদ্ভব তা কেবল বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দূরবর্তী নয়, প্রান্তিকও বটে। ইতিহাস বলে, ভূ-প্রকৃতিগতভাবেও পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ থেকে অনেকাংশে ভিন্নতর যেমনি জনবিন্যাস ও সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও পূর্ববঙ্গ ছিল স্বতন্ত্র। পূর্ব বঙ্গের এই স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ও প্রমানিত হয় প্রথমে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় এবং পরবর্তীকালে একাত্তরে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। “The birth of Bangladesh reaffirmed the partition of a distinct geographical unit and division of a homogenous ethno-linguistic community. Neither part of divided Bengal has exclusive claim over Bengal’s rich cultural heritage” (খান, ২০০১, ২০১৭:১৪)।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁর আলো বাংলাদেশের সমাজের সর্বত্র বা সর্বাংশে প্রতিফলিত হয়নি। আর, ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজ ছিল পিছিয়ে। গান বাজনার মতো ছবি আঁকাও তখন মুসলমান সমাজে/পরিবারে ছিল একরকম অচিন্তনীয় (আলী, ২০০৪:২৫)। মুসলিম পরিবারের বিশ্বাস-সংস্কার-কুসংস্কারের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে-ভেঙ্গেই জয়নুলকে জীবন জয়ের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তখনো বাঙালি মুসলমান সমাজে ছবি আঁকা ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব কতটা প্রবল ছিল তা বোঝা যায় এ ঘটনা থেকে যে “ছোটবেলায় জয়নুলকে জনৈক মৌলভী সাহেব ছবি আঁকার অপরাধে বকাবকি করেছিলেন। ভয় দেখিয়েছিলেন দোজখের (আলী, ২০০৪:৭৩)। এক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ নজরুল ইসলাম। বাঙালি মুসলমানের অচলায়তনের গায়ে নজরুল যে আঘাত হেনেছিলেন তাতে ওই সমাজের পক্ষে বাইরের পানে চোখ মেলে তাকাবার আড়ষ্টতা অনেকাংশে কেটে গিয়েছিল। তবু নিষেধের বেড়াজাল যে ছিলোনা তাতো নয়। বৃটিশ শাসনামলে পূর্ববঙ্গীয় বৃহত্তর মুসলমান সমাজের ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে

আলোকপাত করে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন- "বৃটিশ শাসনামলে পূর্ববঙ্গে মুসলিম ধর্মীয় ব্যবস্থা চালু থাকলেও ধর্মের অনুশাসন ও কুসংস্কার ছিল অনেক বেশি। মুসলমান সমাজে অন্ধবিশ্বাস ছিল অন্যতম। সে সময় মুসলমান সমাজের কোন নারীর বাইরে বেড়ানো নিষেধ, মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করা হারাম এবং কোন ঘরে জীবজন্তু ও মানুষের ছবি, প্রতিকৃতি টাঙানো হারাম বা নাজায়েজ" বলে গণ্য হতো (ইসলাম, ২০০৬:১৬৪)। সমাজের রক্ষণশীলতার ব্যুহ ভেদ করেই জয়নুল বেড়িয়েছেন আত্ম অন্বেষণে। বাঙালি জীবনের যে মূল ভিত্তি কৃষি বা গ্রাম জীবন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে জয়নুলের শিল্প চিন্তা। পিতা যদিও বা পুলিশের নিম্ন পদে চাকুরি করতেন তবু পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল কৃষিকাজ (আলী, ২০০৪:২৪)। ছবি আঁকার প্রতি একটা জন্মগত, যাকে বলে স্বাভাবিক, ঝোঁক নিয়েই জয়নুল পৌছেছিলেন কলকাতায়। জানা যায় যে মায়ের গহনা বিক্রি করে আর্ট কলেজে ভর্তির অর্থ যুগিয়েছিলেন (ঘোষ, ২০১৬:১৭০)। শিল্পকলার প্রতি জয়নুলের অনুরাগ, অভীপ্সা এবং পরবর্তীতে সৃজনশীলতার এই মাধ্যমটিকে আশ্রয় করে তার সমগ্র জীবনের যে আবর্তন তাতে দুটি বিষয় লক্ষ্যনীয়ঃ প্রথমত, ধর্ম-সম্প্রদায়গত সামাজিক-পারিবারিক সংস্কারের বাইরে এসে জীবন গঠনের প্রতিজ্ঞা আর দ্বিতীয়ত, সমকালের প্রেক্ষাপটে স্বদেশকে জানবার আগ্রহ। তাঁর এই দ্বিবিধ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি এদেশের সংস্কৃতিকে-ই শুধু সমৃদ্ধ করেননি, এর ভেতর দিয়ে তিনি শিল্পচর্চায় স্বদেশচিন্তা ও দেশপ্রেমের একটি নতুন অধ্যায়েরও সূচনা ঘটান। প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে এসব লক্ষ্য তিনি সচেতন ভাবেই নির্ধারন করেছেন। নিসার হোসেন যেমনটি লিখেছেন-

> "শিল্প সম্বন্ধে আবেদিনের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা আর্ট কলেজে ঢুকার আগেই তৈরি হতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ নিছক নতুন পেশার সুযোগ নিতে আবেদিন কলকাতা যাননি। শিল্পের সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক, সমাজে এর গুরুত্ব কতটুকু, অনুকরণের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্যটা কোথায়, আত্মপোলব্ধির কি প্রয়োজন, এ সব চেতনার প্রকাশ আর্ট কলেজে ঢোকার কিছুদিন পরই তাঁর কাজে যেভাবে প্রকাশ পেতে থাকে তাতে আমরা নিশ্চয় ওইরকম একটা মতামত গ্রহন করতে পারি। জাতীয় জীবনে শিল্পের যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সেই সচেতনতা থেকেই তিনি আর্ট স্কুলের সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, এবং ঐতিহ্য উপেক্ষিত স্টুডিওকেন্দ্রিক চিত্রচর্চায় ব্রতী না হয়ে ওই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তুলনামূলকভাবে সচেতন শিল্পসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন এবং পরবর্তীকালে আত্মকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে দ্বিধাহীনভাবে নিজেকে নিবেদিত করেন"(হোসেন, ২০০৬:৭৬)।

আবেদিনের স্বদেশচিন্তা ও সমকালীনতার বোধ সম্বন্ধে হোসেনের এ পর্যবেক্ষন ও মন্তব্য যথার্থ। শিল্পী হিসেবে জয়নুল ভারতীয় ঐতিহ্যের ভেতর থেকেই বেড়ে উঠেছেন এবং শিল্প শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষকেরা সকলেই ভারতীয় ঐতিহ্যের শিল্পকারিগর বলে খ্যাত। সে ঐতিহ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবণতা ছিল জীবন ও প্রকৃতিকে রোম্যান্টিক চেতনার রঙে ফুটিয়ে তোলা। সুখকর ও শান্তিময় প্রকৃতি এবং পরিশিলিত নাগরিক জীবন ছিল ওই ঐতিহ্যের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, রামকিংকর বেইজ প্রমুখ শিল্পীগণ ছিলেন সে ঐতিহ্যের পুরোধা। (তবে এই পুরোধাগণের মধ্যে রামকিংকর একমাত্র ব্যতিক্রম)। কিন্তু ঐতিহ্য মানে তো কেবল পুনরাবৃত্তি নয়; যা কিছু পুরানো ও প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত হবার ভেতর দিয়েই তবে বহমান থাকে ঐতিহ্যের ধারা অথবা সৃষ্টি হয় নতুন ঐতিহ্য। একথা অনস্বীকার্য যে "...অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃতভাবে ঐতিহ্যের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ঘটালেই শিল্প-সংস্কৃতি পুষ্পিত হয় না। বরং একটি গ্রাহ্য সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গতিশীল ও প্রাগ্রসর কোনো কিছুতে ঐতিহ্যে(র) রূপান্তরের মাধ্যমেই শিল্প সৃষ্টি হয়" (ওয়ালিউল্লাহ, ২০১৬:১১১)। জয়নুল তাঁর সমকালীন ওই ঐতিহ্যের প্রভাব আত্মস্থ করেই সৃষ্টি করলেন এক নতুন ঐতিহ্য যার স্থায়ী ভিত্তি সাধারণ মানুষের

জীবন বাস্তবতা। রিয়েলিজম চিত্রশিল্পের এক বিশেষ শৈলি হিসেবে আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জয়নুলের রিয়েলিজম হয়ে উঠল আরো বেশি জীবনঘনিষ্ঠ, আরো বেশি শক্তিমান- যেখানে রহস্যময়তার কোনো জায়গা রইল না। এই যে মানুষ ও তাদের জীবন তা শিল্পের সূক্ষ্ম বিচারে সর্বজনীন, কিন্তু মোটা দাগে এরা এই বাংলার অথবা আরো স্পষ্ট করে বললে হয় পূর্ব বাংলার খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষ। "কলকাতার আর্ট স্কুলের শেখানো তত্ত্বকে তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে" না দিলেও সেখানে তিনি আনলেন বস্তু, প্রাণী, নিসর্গ- এই তিন উপাদানের সজীব, চঞ্চল, উদ্দাম এক জঙ্গমতা যার প্রতিভাস কেবল শিলপকর্মে উপস্থাপিত বস্তু, প্রাণী, নিসর্গের মধ্যে আটকে রইলোনা তা সঞ্চারিত হলো দর্শকের মধ্যেও (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:২৪)। জয়নুলের দেশ মানে মাটি সংলগ্ন মানুষ যাদের প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে এক বিশেষ দ্বন্দ ও বোঝাপড়া। আর এভাবে তিনি বাংলার শিল্প ঐতিহ্যের ধারায় যোগ করেছেন প্রান্তিকতা যা কালক্রমে হয়ে ওঠে এক অতি শক্তিমান কেন্দ্র। এ অর্থে তিনি প্রথাবিরোধী বা ঐতিহ্যবাদ বিরোধী। প্রাচ্যদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। জয়নুল ঐতিহ্যের অন্ধ প্রীতি পরিহার করেছেন তাঁর সহজাত ও স্বাভাবিক শিল্পদৃষ্টি দিয়ে। ছবিতে তিনি সমকালকে তুলে ধরেছেন স্বদেশের পটভূমিতে আর স্বদেশকে উন্মোচন করেছেন স্বকাল বা সমকালের আলোয়। জয়নুলের ছবির সমঝদার খুঁজতে শহুরে ভদ্রলোক সমাজে বা গ্রামীন অভিজাত সমাজে যাবার দরকার পড়েনা, শ্রমজীবী-কৃষিজীবি সাধারণ মানুষই তার ছবির ভাষা বোঝার জন্য যথেষ্ট। "নৌকার মাঝি কিংবা মাঠের খেত নিড়ানি চাষি বা ঘাস কেটে বাড়িমুখো রাখাল যুবক- এঁরাই ছিল তাঁর ছবির সমঝদার (আতিকুল্লাহ, ২০১৬:৮০)।

পূর্ব বঙ্গের মানুষ হিসেবে দু'দুটো ঔপনিবেশিক কালপর্ব পার করেছেন জয়নুল আবেদিন- প্রথমটি বৃটিশ উপনিবেশ, আর দ্বিতীয়টি পাকিস্তানী। কিন্তু স্বদেশানুভূতিতে তিনি বরাবরই থেকে গেছেন বঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয়। ছবিতে তিনি স্বদেশকে ধরেছেন মূলত মানুষের ভেতর দিয়ে। তাঁর মানুষেরা কর্মনিরত মানুষ যারা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রামীণ বাংলাকে ছবির বিষয়বস্তু করবার প্রবণতা তাঁর কাজে একেবারে প্রথম থেকেই লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম পর্বের যে প্রথম রাষ্টীয় স্বীকৃতি তিনি অর্জন করেন সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর অবলম্বন পূর্ব বাংলার প্রকৃতি। ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর আঁকা গোটা ছয়েক মাত্র ছবি জয়নুলকে এনে দেয় জাতীয় স্বীকৃতি, তিনি অর্জন করেন বৃটিশ গভর্নরের স্বর্ণ পদক। বৃটিশ ভারতীয় বা কলকাতা পর্বে তিনি গড়ে উঠেছেন ভারতীয় ঐতিহ্য আশ্রিত একটি ঔপনিবেশিক আবহে। সে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের বিষয় যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে শিল্পী মনের সংবেদী সংশ্লেষণ। দ্বন্দ আর দ্রোহ সেখানে শিল্পী হিসেবে জয়নুলকে ক্রমশই অগ্রসরমান করেছে আত্মপ্রকাশের আপন আলোর পানে। ভারতীয় পর্বে বাংলার শিল্প ঘরানায় প্রত্যক্ষতা ছিলো বটে তবে তা এক প্রকারের রোম্যান্টিকতার আবেশে আচ্ছন্ন ছিল। আবার বাস্তবতারও রকমফের রয়েছে নিশ্চয়। বেঙ্গল স্কুল, কলকাতা আর্ট কলেজ ও শান্তিনিকেতনী যৌথ ঘরানায় একমাত্র রামকিংকর ব্যতীত আর কারো কাজে প্রত্যক্ষ জীবনের উপলব্ধি অত প্রবল হয়ে ওঠেনি। এ বিবেচনায় বিষয়বস্তুগত ও অংকনশৈলীগত দিক থেকে একমাত্র রামকিংকরের সঙ্গেই সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় জয়নুলের (হোসেন, ২০০৬:৭৭)। অবনীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মধ্যে যে স্বপ্নময়তা, অতীতচারিতা আর কল্পরাজ্যের বিন্যাস তা থেকে স্বাভাবিক প্রবণতায় আর সচেতন প্রয়াসে জয়নুল দূরে চলে আসেন। যে অন্তর্গত ঝোঁক জয়নুলের শিল্প অন্বেষার পেছনে কার্যকর ছিল তার সঙ্গে তার আপন সত্ত্বা, সমাজ তথা স্বদেশ অন্বেষার অভীপ্সার বিষটিও জড়িয়ে রয়েছে। সেই অন্বেষণের কাজটি যে কেবলি কাগজে কলমে কল্পনায় করেছেন তা নয়, শারীরিক ভাবেও তিনি গিয়েছেন মাটি ও মানুষের কাছে। যেমনটি জানাচ্ছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ-

> "দেশকে নিবিড়ভাবে জানার জন্য অল্প অবসরেও জয়নুল কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতেন তিনি। ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্রের

উপত্যকাই ছিলো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এখানকার কৃষক, ক্ষেতমজুর, মাঝিমাল্লা, কামার কুমোর তাঁতী প্রভৃতির জীবন তাঁকে মুগ্ধ করতো। বিভাগ পূর্বকালে তিনি প্রায়ই যেতেন সাঁওতালদের লালমাটি ও কাঁকর বিছানো দুমকা অঞ্চলে। সেখানকার পাহাড়ী এলাকার শালবন আর মহুয়া গাছ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। সাঁওতাল ছেলেদের বাঁশি বাজানো, মেয়েদের মাথার পলাশ শোভিত খোঁপা তিনি আমাদের চিরকালের জন্য উপহার দিয়েছেন। বীরভূমের শীর্ণ ময়ূরাক্ষী নদীটি ছিলো তাঁর বড়ই প্রিয় (মকসুদ, ২০০৬:২৪৫)।"

সুতরাং জয়নুলের কাছে স্বদেশ মানে সাধারণ আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের জীবন আবর্তিত হয় মাটি আর প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে। তাঁর ছবিতে নাগরিক জীবনের ভদ্রলোকি স্নিগ্ধতা নেই, নেই সেখানের নিসর্গ। বীরভূমের দুমকার মতো তাঁকে টেনেছে ময়মনসিংহ। জয়নুলের নগর হাজির হয় মারী আর মন্বন্তরের পটভূমি রূপে। ১৯৪৩-এর ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে আঁকা তাঁর চিত্রগুলো কেবল বাংলার ঔপনিবেশিক কালের একটি অধ্যায় রচনা করেননি, সেসব চিত্রমালার ভেতর দিয়ে এক অভূতপূর্ব স্বতস্ফূর্ততায় তাঁর মানবদরদী মনের আর্তির প্রকাশ ঘটেছে। মারী আর মন্বন্তর যে শিল্পকলার বিষয় হতে পারে এটি ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যে এমন প্রবলভাবে জয়নুলের পূর্বে আর কেউ ভাবেনি। দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা একদিকে যেমন ইতিহাসের বয়ান এবং সঙ্গত কারণেই তার অন্তরালে বহমান থাকে রাজনীতি তেমনি ওই সময়ে আঁকা সেসব ছবির ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর স্বদেশচিন্তা। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে ওই ছবি হয়ে ওঠে এক যুগান্তরের স্মারক। জীবনকে এমন অকপট আর নিরাভরণ আকরণে হাজির করা এই প্রথম। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার, আহাজারি, আর ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার দৃশ্যাবলী শিল্পী জয়নুলের মানবিক মনকে নিশ্চয় ব্যথিত বিহ্বল করেছিল। কেননা হৃদয়ের আর্তি না থাকলে শুধু জ্ঞান আর কারিগরি দক্ষতা দিয়ে মহৎ শিল্প রচনা করা সম্ভব নয়। সে জ্ঞান আর দক্ষতা আরো অনেকেরই ছিল নিশ্চই কিন্তু জয়নুলের পথে আর কাউকেও দেখা যাচ্ছেনা অমন দরদ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে! সুগভীর আর সর্বমানবিক বোধ না থাকলে সামান্য কিছু উপকরণের সাহায্যে (কালি, কাগজ আর মোটা তুলি) অমন অসামান্য দক্ষতায় সেসব ছবি আঁকা সম্ভব হতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ করা যেতে পারে। দুর্ভিক্ষের মতো মানবিক বিপর্যয় জয়নুলের আত্ম আবিষ্কার ও স্বতন্ত্র শৈলীতে আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দেয়। সে আবিষ্কারের তুঙ্গ স্পর্শ করে তার হৃদয় জাগানিয়া চিত্রমালায় যাতে দৃশ্যায়িত হয়েছে সমসাময়িক সংকটের বাস্তবঘন রূপ। যে বিষয়টি লক্ষ্য করবার মতো তা হচ্ছে জয়নুলের জন্য ছবি আঁকা নিছক একজন আঁকিয়ের মুন্সিয়ানা অর্জন বা ক্যারিয়ার গড়বার বিষয় হয়নি কখনো; ছবি আঁকা ছিল তাঁর জন্য জীবনকে জানা, বোঝা এবং সর্বোপরি মাটি ও মানুষরূপী দেশ বা দেশরূপী মানবতার সেবা করবার একটি মাধ্যম ও উপায়। "মন্বন্তরে কলকাতাজুড়ে মৃত্যুর মিছিল আর মানুষের জীবনের নির্মম অবমাননাই মূলত তাঁর শিল্প ও জীবনদর্শনে এক ব্যাপক আলোড়ন তোলে, মধ্যবিত্ত জীবনের ভারসাম্যময় স্বস্তি বিনষ্ট করে মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের এক সংকট প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকে। ফলে দুর্ভিক্ষ ও এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট শিল্পকর্ম

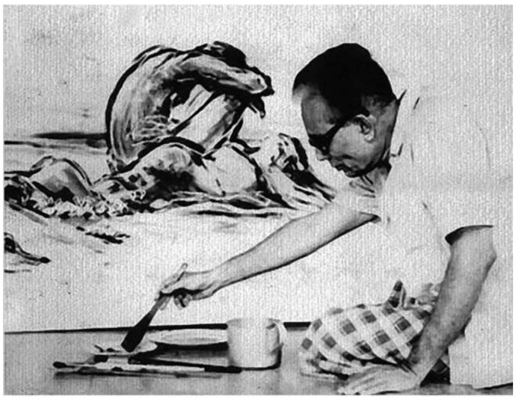

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

জয়নুলের জীবনে যেন এক অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের শিল্পশৈলী নির্ধারণে বার বার প্রভাব ফেলেছে। কখনো কখনো সজ্ঞানে তিনি এই গন্ডি ছেড়ে বেরোতে চেয়েছেন, শিল্পের চলমান আধুনিকতর প্রকরণের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবারও ফিরে গেছেন নিজ স্বাচ্ছন্দ্যর জায়গায় (মনসুর, ২০১৩:২১)।" কিন্তু 'চলমান আধুনিকতা' বলতে যা বুঝায়, যার উদ্ভব পশ্চিম তথা ইউরোপের বুকে, যার প্রবল প্রভাবে সম্মোহিত হয়েছে পূর্বের নাগরিক মধ্যবিত্ত, তাঁতে জয়নুলের মতো স্বভাবের মানুষ যে থিতু হবেননা, হওয়া সম্ভব নয় -সেটি ছিল স্বাভাবিক। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৭ সময়ে জয়নুল অতিক্রম করেছেন স্বদেশের বুকে এক অস্থির সময়। স্বদেশি সমাজ ও রাজনীতি তখন নানাবিধ স্রোতের আবর্তে অগ্রসরমান। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমশই তখন বিবর্তিত হচ্ছিল হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমীকরণ-সংঘাতের দিকে। বিশেষত ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের সেই প্রবল স্রোতের ভেতরে থেকেও দেখা যাচ্ছে জয়নুল রয়েছেন স্তিতধী স্রষ্টার মতো সুস্থিত। স্বদেশ তাঁর চেতনায় বহমান থাকে লোকায়ত বাংলার চিরায়ত রূপ নিয়ে। সেখানে মানুষের কোনো ধর্ম সাম্প্রদায়িক পরিচয় নেই, সেখানে ভূগোল মানে লক্ষ গ্রামের জালে বোনা নদীনালা-খালবিল বিধৌত এই শ্যামল বাংলা। স্বদেশ মানে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট এই বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের এবং ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মানবিক বিপর্যয় স্বদেশ সম্পর্কে জয়নুলকে তাঁর আপন উপলব্ধিতে নিয়ে যায়। তিনি অর্জন করেন একটি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বমানবিক বোধ। অবশ্য কলকাতা নগরীর অতি দীপ্যমান সৃষ্টিশীল আর মানবিকতাপূর্ণ একাডেমিক আবহের মধ্যে থেকে তিনি ইতোমধ্যেই একটি আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। তাই জয়নুলের জীবনের বৃটিশ ভারতীয় কলকাতা পর্বটি (১৯৩৩-১৯৪৭) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত কেননা "সেই পর্বেই তিনি মোটামুটি অর্জন করেছিলে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উর্ধ্বে তাঁর সহজিয়া মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটি (মনসুর, ২০১৩:২০)।" সেটি তাঁর পরবর্তী জীবনেও বহমান থাকে।

দুর্ভিক্ষের ছবি জয়নুল একাই আঁকেননি। সে সময়কার প্রায় সকল বাঙালি শিল্পীই মন্বন্তরকে বিষয়বস্তু করে কিছু না কিছু ছবি এঁকেছেন (মনসুর, ২০১৩:৩২)। সেটি ছিল স্বাভাবিক কেননা একজন শিল্পীর সংবেদনার পক্ষে যে কোনো সামাজিক-মানবিক বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে মন্বন্তরের মানবিক বিপর্যয়ের বয়ান সবচেয়ে বেশি 'ক্ষোভে-ক্রোধে ও সত্যিকারের সহমর্মিতায়' অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠেছে জয়নুলের কাজে। তাঁর সমান্তরালে আর যে দুজনের নাম এ বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য তারা হলেন চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও সোমনাথ হোর (মনসুর, ২০১৩:৩৩)। তবু একমাত্র জয়নুলই থাকেন সে ইতিহাসের প্রধান দ্রষ্টা হয়ে। থাকেন এ কারনে যে অন্যরা যেখানে ঘটনার সমসাময়িকতার মধ্যে নিঃশেষিত জয়নুল সেখানে ঘটনার সমসাময়িকতা, এমনকি তার স্থানিকতাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে সম্প্রসারিত করে প্রবাহিত করে দেন রাজনীতি, তত্ত্ব ও মতাদর্শের নানান ক্ষেত্রে এবং ফলত তা কালক্রমে জয়নুলের শিল্পদর্শনের একটা মৌল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু বিষয় নির্বাচনের মধ্যে নয়, জয়নুলের অংকনশৈলীর বিশেষত্বের মধ্য দিয়েও তাঁর শিল্প দর্শনের স্বাতন্ত্র ও নতুনত্ব পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। কলকাতা আর্ট কলেজে ইউরোপীয় একেডেমিক পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা নিয়েও তিনি সে রীতি

দুর্ভিক্ষ ■ জয়নুল আবেদিন ■ ১৯৪৩

পরিহার করলেন বললেই চলে। "ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতিতে হুবহু অনুকরণের যে মন্থর হিসাবী কৌশল তা খুব সহজেই তাঁর আয়ত্তে চলে আসে, কিন্তু তিনি এর পরিবর্তে দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতা দিয়ে অবয়বের আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতি বা স্বভাবকে কিভাবে ধরা যায় সেই দিকে উৎসাহী হলেন"(হোসেন, ২০০৬:৭৭)। দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় রেখাই প্রধান কিন্তু তাতে এতটুকু লাবন্য বা লালিত্য নেই। বরং তাতে ক্ষিপ্রতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যেন শিল্পী হৃদয়ের অনুচ্চারিত ক্ষোভ। "তেতাল্লিশের মন্বন্তরে কলকাতার ফুটপাতে অনাহারক্লিষ্ট ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শরীরী অবয়বের বীভৎস ভাঙচুর শিল্পীর মোটা তুলির কালো আঁচড়ে প্রথম যেন তাদের অস্থি-মজ্জা-যন্ত্রণা-প্রতিবাদসহ মূর্ত হয়ে ওঠে"(মনসুর, ২০১৩:২৪)। বাস্তববাদিতা বা স্বদেশের অনুভব, উচ্চারণ বেঙ্গল স্কুল রীতির মধ্যেও ছিল বৈকি যেমনটি ছিল নিসর্গ বা কর্মরত মানুষের চিত্রায়নে। কিন্তু বেঙ্গল স্কুল রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সবকিছুকেই একটা রোম্যান্টিকতার আবরণে/আবহে হাজির করা। আরো যে একটি বিশেষত্বে বেঙ্গল স্কুলকে চিহ্নিত করা যায় তা হচ্ছে সেখানে স্বদেশ চেতনার পরিপূরক হিসেবে ইতিহাস বা সাহিত্যের কোনো বিষয়ের পাশাপাশি হাজির করা হয়েছে হিন্দু ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী। যে মোহমুগ্ধ, লালিত্যময়, সৌন্দর্যচেতনার ঐতিহ্য বেঙ্গল স্কুল সৃষ্টি করেছিল জয়নুল তার বিপরীতে হাজির করেন এক ভিন্ন ন্যারেটিভ- মিসটিফিকেশন-এর বিপরীতে ডিমিসটিফিকেশন। "বলা যেতে পারে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তাঁর ছবিতেই সর্বপ্রথম কায়িক শ্রমের নিষ্ঠুর কর্কশ রূপ, প্রকৃতির রুদ্র-নির্মম বিস্তার তার সকল বাস্তব অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর ছবিতে বিম্বিত হয়েছে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী সম্প্রদায়-চিহ্নহীন নিম্নবর্গের মানুষের অপরাজেয় রূপ, যা তাকে দিয়েছে তাৎক্ষণিকতার সীমা-অতিক্রমী ব্যঞ্জনা (মনসুর, ২০১৩:৩৯)।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৭-এ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসানের আরেক নাম দেশভাগ। আগে যা দেশ বলে জানা ছিল '৪৭-এর আগস্টের পরে তা-ই হলো রাষ্ট্র। দেশ ভেঙে রাষ্ট্র হলো আর সেই ভাঙা-ভাঙি বা ভাগা-ভাগীর যে বিপর্যয় তার সবচেয়ে বেশী ভাগীদার হলো বাংলার মানুষ। '৪৭-এর দেশভাগ তো রাজনৈতিক ব্যাপার ছিলো বটে কিন্তু তার অভিঘাতটি রাজনীতি-রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়ার মধ্যে সীমিত ছিলোনা। কেননা ইতিহাসের ঐ ঘটনাটি এ উপমহাদেশের সামগ্রিক সমাজ-বিন্যাসে এক বিরাট অনুঘটকের কাজ করে। বৃহত্তর বাংলার ক্ষেত্রে তা আরো বেশি সত্য হয়ে ওঠে। বাঙালির শিল্প-সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর হয়ে দেখা দেয়। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে দেশভাগের বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে যতোটা ব্যাপকতা নিয়ে হাজির হয়েছে তুলনামূলক বিচারে শিল্পকলার ক্ষেত্রে ততখানি পরিসর নিয়ে হাজির হয়নি। কিন্তু যে প্রশ্নটি শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে কেন্দ্র করে বারে বারে ঘুরে ফিরে আসে তা হলো '৪৩-এর মন্বন্তর যাকে এত আলোড়িত করল '৪৭-এর দেশভাগ তাঁকে এতটুকুও স্পর্শ করলনা! তবে দেশভাগের মানবিক বিপর্যয় নিয়ে জয়নুলের এই নীরবতার একটা কারণ হতে পারে এই যে মন্বন্তরের বিপর্যয়টি আপাত দৃষ্টিতে একান্তই মানবিক; রাজনীতি যদিও তার অন্তরালে উপস্থিত কিন্তু সে উপস্থিতিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের সেই অমানবিক মৃত্যু। অপরদিকে '৪৭-এর দেশভাগ ও তার বিপর্যয় প্রত্যক্ষভাবেই চলমান একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। জয়নুল শিল্পী এবং মানুষ হিসেবে বরাবরই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন বলা যায়। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুরের প্রত্যক্ষণ প্রনিধানযোগ্য। তার ভাষায়-

> " ...জয়নুল কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উপলব্ধি দ্বারা চালিত হননি, তিনি এ চিত্রমালা অঙ্কনে প্রণোদিত হয়েছিলেন নিতান্ত ব্যক্তিগত মানবিক তাগিদ থেকে। দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কে তিনি দেখেছেন কলকাতার ফুটপাতে মানবতার চরম লাঞ্ছনার চিত্র রূপে। তাঁর চেনা পূর্ব বাংলার গ্রামের কিষানকে, লাজনম্র পল্লীবধূকে কলকাতার রাস্তায় উদ্বাস্তু, বে-আব্রু হয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো মরতে দেখে নির্মম ও উদাসীন নাগরিক সভ্যতার প্রতি

> তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণায় আন্দোলিত হয়েছিলেন জয়নুল। তাঁর চিত্রমালা যেন সে প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা উদগিরণ। .... রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব জয়নুল-চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত নয়, যা আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনের দীর্ঘ পরিসরে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। প্রায় সকল রাজনৈতিক-সামাজিক সংগ্রামে তিনি জনতার সঙ্গে থাকেন, তবে কোনো রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে নয়, তাঁর নিজস্ব মানবিক বোধের তাগিদ ও বিবেচনা থেকে (মনসুর, ২০১৩:৩৩)।"

যদিও মন্বন্তরের যেসব মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে গ্রামে, শহরে তাদের কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় নেই। তবে তাদের শ্রেণি পরিচয় সহজেই অনুমেয় তারা এই বঙ্গেরই, বিশেষত এই পুর্ব বঙ্গের চাষাভূষা-কৃষক। তেতাল্লিশ যদি হয় মানবিক তাহলে সাতচল্লিশকে বলতে হবে সাম্প্রদায়িক। '৪৭-এ যারা দাঙ্গা বাঁধাল তারা হয় হিন্দু না হয় মুসলমান, মানুষ কথাটি তাদের বেলায় আসেনা। কলকাতা পর্বে জয়নুলের যে সামাজিক অভিজ্ঞতা সেখানে সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততার কোনো রেশ পাওয়া যায়না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে তিনি বরং ওখানের শিল্পী মহলে খানিকটা যেন বেশিই আদরনীয় হয়ে উঠেছিলেন। বেশি না হলেও অন্তত তিনি যে কোনো বিবেচনায় বৈষম্যের শিকার হননি এটি হলফ করে বলা যায়।

তবু একজন বাঙালি মুসলমান হিসেবে পাকিস্তান নামক 'স্বতন্ত্র আবাসভূমি'র যে স্বপ্ন ও তা বাস্তবে রূপায়িত হবার যে বাস্তবতা তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা জয়নুলের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। তাই দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা আর্ট স্কুলের চাকুরি ছেড়ে জয়নুল চলে এলেন পূর্ব বঙ্গের ঢাকায় যার নতুন পরিচয় হলো পূর্ব পাকিস্তান। শুরু হয় তাঁর স্বদেশ অন্বেষার দ্বিতীয় পর্ব।

দেশভাগের আগে ময়মনসিংহ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল, জয়নুল পূর্ব বঙ্গের মানুষ। শিক্ষালাভের জন্য তিনি হাজির হয়েছিলেন যুক্ত বঙ্গের মহানগরী কলকাতায়। কিন্তু দেশভাগের পরে যেখানে ফিরে এলেন তাও তার নিজের দেশ যদিও তা অন্তর্ভূক্ত হলো এক নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে। জয়নুলের ক্ষেত্রে দেশ আর রাষ্ট্র এক নয়, রাষ্ট্র যতোই তার রূপ আর নাম বদলাক না কেন দেশ তার একই থাকে যার নাম পূর্ব বাংলা। জয়নুলের দেশ হচ্ছে চিরায়ত মানুষ ও প্রকৃতির এক সন্বিত ধারণা। আর একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে দেশ ভাগ না হলে তিনি কলকাতাতেই থেকে যেতেন। কেননা সেখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি যাদেরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন উদার মানবতাবাদী জীবনদর্শনের অনুগামী। আর শিক্ষা সমাপন্তেও এক প্রকার অনায়াসেই আর্ট কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন জয়নুল। পূর্ববঙ্গের মফস্বল থেকে উঠে গিয়ে তিনি খুব সহজে কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন প্রথম থেকেই। পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্র উন্মাদনা সত্ত্বেও তিনি তাতে নিস্পৃহ থাকলেন বলা যায় (মনসুর, ২০১৩:১৯)। নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র সাধারণ মুসলমানের মধ্যে একটা উন্মাদনা তৈরি করলেও অনেক শিক্ষিতজনের মধ্যে তা এক রকমের শংকা-সন্দেহও তৈরি করেছিল। অনেকেই ছিলেন নিস্পৃহ। হয়তো স্রোতের টান তারা উপেক্ষা করতে পারেননি কিন্তু সে স্রোতের সহগামী হতে গিয়েও নানারকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। "ভারত বিভাগের পর তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা মোহহীন চোখ নিয়ে পাকিস্তানে আসেন, একত্র হন ঢাকায় (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:১৫)।" জয়নুলের সঙ্গে আর যে দুজন এলেন তাঁর শিল্প সহগামী হয়ে তাঁরা হলেন কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমদ। দেশভাগের পরেও পঞ্চাশ-ষাট দশকের পাকিস্তান রাষ্ট্রে শিল্প চর্চা, বিশেষ করে ছবি আঁকার মতো চারুশিল্পের চর্চা ছিল এক চ্যালেঞ্জের কাজ। প্রথমত, পূর্ব পাকিস্তানে ছবি আঁকার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলোনা। দ্বিতীয়ত, ছবির সামাজিক ও বাণিজ্যিক সমঝদারের অভাব। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় পূর্ব পাকিস্তানে চিত্র শিল্পের বাজারমূল্য বলতে তেমন কিছু ছিলোনা। ঢাকার সমাজ তখনো রক্ষণশীলতার চাদরে মোড়ানো, ভাস্কর্য তো দূরের কথা দেয়ালে ছবি টাঙ্গাতে পর্যন্ত

তখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি ঢাকার মুসলিম সমাজ। জানা যায় অনেক পরিবারে প্রতিকৃতি বা ফটোগ্রাফকেও ইসলাম বিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হতো (ইসলাম, ২০০৬:২৫১)। সমাজ মানসের এরকম প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ যার মূল কথা ধর্মীয় মৌলবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা। পাকিস্তান পর্বে জয়নুল রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। বাঙালি প্রধান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক মনোভাব ও আচরণের প্রেক্ষিতে সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই জন অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। জয়নুলের তুলিতে বাঙালি মানসে জায়মান অসন্তোষ আর ক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে পঞ্চাশের শুরু থেকেই যদিও তা প্রতীকি ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। উদাহরণ হিসেবে ১৯৫১ সালে আঁকা জয়নুলের 'বিদ্রোহী গরু' চিত্রকর্মটির কথা বলা যেতে পারে। ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবীতে বাঙালির প্রাণদান হতে তখনো এক বছর বাঁকি। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র শিক্ষিত বাঙালি তরুণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব সংঘটিত হয়ে গেছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের মধ্যেই। 'বিদ্রোহী'র পটভূমে একটি ক্ষিপ্ত প্রাণীর অবয়ব মাত্র একটি গরু বা গাভী -যার সঙ্গে বাঙালি জীবনের রয়েছে অতি নিবিড় সম্পর্ক। অত্যন্ত বলশালী প্রাণীটির দেহসৌষ্ঠব জুড়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে দ্রোহের প্রকাশ, যেন রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি যুবার স্পর্ধিত প্রতিবাদ! লক্ষ্য করা যেতে পারে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই জয়নুল মুসলমান ইতিহাস ও রাজনীতি কেন্দ্রিক কিছু ছবি আঁকেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'সুলতান মাহমুদের দিল্লি বিজয়' এবং 'কায়েদে আযমের সমাধির পথে' (১৯৪৮)। পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে অনুষ্ঠিত পোস্টার প্রদর্শনীর পোস্টারগুলো জয়নুল করেছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ অনুযায়ী বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পোস্টারগুলো তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষে মুসলমানদের আধিপত্যের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে। "সেসব পোস্টারের বিষয় ছিল ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের শুরু থেকে অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের দিল্লি বিজয় থেকে মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান গড়ে তোলা পর্যন্ত মুসলিম কৃতিত্বের দিকচিহ্নগুলি (ঘোষ, ২০১৬:১৭৩)।" কিন্তু এরকম কাজকে ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে কেননা এ ধারার কাজে তিনি স্থায়ী হননি। হবার কারণও ছিলোনা। পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তিনি করেছিলেন বটে কিন্তু রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্র প্রকাশ হতে থাকলে আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি তিনি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। এটা ছিল এক ঐতিহাসিক বাস্তব যে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে থেকেই পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বাঙালি মুসলমানকে তাঁর আপন জাতি সত্তাগত আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে নতুন করে ব্রতী হতে হয়েছে। রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েই তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, জয়নুল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল আনুকুল্য, সম্মান, স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। আবার তা যথাসময়ে বর্জনও করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের দুটি সম্মানজনক উপাধি, যথা- 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' এবং 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ', তাঁকে দেয়া হয় ১৯৫৯ সালে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' তিনি ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রত্যাখ্যান করেন। জয়নুলের সে খেতাব বর্জনের ধরণটিও হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক কেননা তিনি সে কাজটি "করেছিলেন মমনসিংহে বিশাল জনসভায় দেশবাসীকে সামনে রেখে (আলী, ২০১৬:১৯৬)।" যে কারণে পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে তিনি আঁকছেন মাওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতি। ঢাকায় আর্ট ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার জন্য জয়নুল রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা নিয়েছিলেন, তা ছাড়া সম্ভবও ছিলোনা। ১৯৪৮ সালে জয়নুল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার বিভাগে সম্প্রচার শাখায় চাকুরি পেয়ে এক বছরের জন্য করাচি যান। পরের বছর ফিরে আর্ট ইন্সটিটিউটে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রেখেও জয়নুল তাঁর প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয়

চেতনাকে প্রশ্রয় দেননি (হোসেন, ২০১৬:২০৭)। স্বদেশকে বা পূর্ব বাংলাকে তিনি তাঁর শিল্প অন্বেষার বিষয় করেছেন সেখানের সমাজ-সংস্কৃতি-নিসর্গের ভেতর দিয়ে। জয়নুলের স্বদেশ অন্বেষার একটি অন্যতম বিষয় হয়েছে লোক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শিক চাপ এড়াতে শুধু নয় (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:১৫), পূর্ব বঙ্গের ধর্ম নিরপেক্ষ নিসর্গ সম্পৃক্ত লোকায়ত জীবনকে শিল্পের বিষয়বস্তু করবার ভেতর দিয়ে তিনি ঐ ভাবাদর্শের প্রতি প্রতিবাদও হেনেছিলেন। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ছিল বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। আর ঐ সময় থেকেই, দেখা যাচ্ছে, জয়নুলের ছবি হয়ে উঠেছে লোক ঐতিহ্যমুখী। মানুষকে তিনি তুলে ধরেছেন একই সঙ্গে মাটি ও নিসর্গ ঘনিষ্ট এবং সংগ্রামী ও প্রতিবাদী রূপে। সংগ্রাম তাঁর পরিস্থিতি ও প্রকৃতির সঙ্গে, প্রতিবাদ তাঁর মানুষ কৃত অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে। জয়নুল আবেদিনের স্বদেশ অণ্বেষার স্বরূপ উদঘাটন করে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন-

> "জয়নুলের স্বদেশ ছিল দারিদ্র্য পীড়িত, শোষিত এবং বঞ্চিত; কিন্তু একই সঙ্গে এই স্বদেশের মানুষ সংগ্রামী, তেজী, এবং তারা টিকে থাকে প্রকৃতি ও রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক নানা সংঘাতে নিজের শক্তি প্রকাশ করে। এজন্য জয়নুলের বাস্তবতা একদিকে তাঁর সমকালের ঘনিষ্ট চিত্র আঁকতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ইতিহাসের সুবর্ণ নানা সময় এবং মাটির নিবিড় টানকে তিনি মূর্ত করেছেন এক প্রচ্ছন রোমান্টিকতা দিয়ে। তাঁর নিসর্গ দৃশ্য একই সঙ্গে বাস্তব এবং রোম্যান্টিক। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের চালচিত্র বর্ণনাতেও তাঁর বাস্তবতা কখনো মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে না। জড়ানো পটের ঐতিহ্যে আঁকা তাঁর স্ক্রল চিত্রগুলি -যেমন ৬৫ ফুট দীর্ঘ 'নবান্ন' এবং ৩৩ ফুট দীর্ঘ 'মনপুরা' গ্রামের মানুষের সংগ্রামী জীবন ও তাদের স্বপ্নের একটি আখ্যান রচনা করে (ইসলাম, ২০০৬:২৫২)।"

সাওতাল রমণী ■ জয়নুল আবেদিন ■ ১৯৫১

১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে জয়নুলের কাজের প্রতি চোখ রাখলে সেখানে পাকিস্তান নয়, বরং পূর্ব বাংলাকেই প্রবলভাবে পাওয়া যাবে। এ পর্বে তাঁর ছবিমালার মধ্যে রয়েছে মা ও শিশু, পাইন্যার মা, কলসী কাঁখে নারী, জলকে চলে নারী, স্নানরতা, স্নান শেষে নারী, আয়নাসহ বধূ, কেশবিন্যাসরতা নারী, বনাঞ্চলে একাকিনী, বিশ্রামরতা নারী, চিন্তান্বিতা নারী প্রভৃতি। তাঁর ছবির মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনও, যেমন রয়েছে সাঁওতাল ও বেদে সম্প্রদায়। সাঁওতালদের নিয়ে আঁকা তাঁর তিনটি ছবিই ১৯৫১'র কাজ- 'সাঁওতাল দম্পতি', 'দুজন সাঁওতাল রমণী', ও 'সাঁওতাল পরিবার'। জয়নুলের নারীরা তাঁর মাতৃভূমিরই বিচিত্র প্রতিকল্প, এসব

চিত্রে কেবল নারীর সৌন্দর্যের বিষয়টিই অন্বিষ্ট হয়ে ওঠেনি, "বরং একথাই মনে হয়, দেশমাতৃকার রূপান্বেষার আন্তরিক গরজই তার মধ্যে সক্রিয়। পাকিস্তানী শাসকচক্রের রক্ষণশীল ও শোষণমূলক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশের দশকে প্রাগ্রসর বাঙালি মানসে জাতিসত্তা সন্ধানের যে সুগভীর আগ্রহ জাগ্রত হয় জয়নুল তা দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন (হক, ২০০৬:২৩৯)।"

বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোহ কাটতে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের গোঁড়া থেকে। জয়নুল মানসের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক লোকায়ত জীবনকে আদর্শায়িত করবার প্রতি। নদীনালা-খালবিল আকীর্ণ, সমতল ভূমিবৈশিষ্ট্যপূর্ণ পূর্ব বঙ্গ মূলত একটি গ্রামপ্রধান ভূখন্ড। এখানের জনজীবন কৃষি ও কৃষক কেন্দ্রিক। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই জয়নুলের মধ্যে বাংলার লোক ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। লোকশিল্পের ব্যাপারে জয়নুলের গভীর আগ্রহের মধ্যে তাঁর স্বদেশ অন্বেষার আরেকটি দিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিজের আগ্রহকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন পূর্ব বাংলার নাগরিক মানসে। সে উদ্দেশ্যে ঐ দশকের মধ্যেই দুইবার- ১৯৫৫ ও ১৯৫৯-এ ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট ভবনে লোকশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং একটি লোকশিল্প যাদুঘর গড়ে তোলার ব্যাপারে জনমত গঠনের অভিপ্রায়ে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন (হোসেন, ২০১৬:২০৯)। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আঁকা জয়নুলের চিত্রকর্মগুলোর পানে তাকালে বোঝা যায় কত নিবিষ্ট মননে তিনি তাঁর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক জাতিসত্তাগত আত্মপরিচয়কে তুলে ধরবার প্রয়াস নিয়েছেন। এ সময়ে আঁকা তাঁর 'বিদ্রোহী গরু', 'খেয়াঘাটে অপেক্ষা', 'মই দেওয়া', 'গুণ টানা', 'মাছ ধরে বাড়ি ফেরা', 'কাদায় আটকে পড়া গরুর গাড়ি টেনে তোলার সংগ্রাম' প্রভৃতি চিত্রাবলীর ভেতর দিয়ে কৃষি প্রধান পূর্ব বঙ্গীয় লোকজীবনের প্রতি তাঁর গভীর টান ও সে জীবনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগের পরিচয় মেলে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব বাংলা কেন্দ্রীয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেবল ভৌগলিক দূরত্বের নিরিখেই প্রান্তিক ছিলোনা, পূর্ব বঙ্গের প্রান্তিকতা মূলত এর প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে তৈরি হয়। বাঙালি মুসলমানকে হেয়তর হিসেবে দেখা এবং বাংলা সংস্কৃতিকে পাকিস্তানের ঐক্য ও আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করবার ভেতর দিয়ে শাসকবর্গ তাঁদের কূপমন্ডুকতার পরিচয় দিয়েছিল। পাকিস্তান যে একটিমাত্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে তৈরি হয়নি, এর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য -এ ধারণাটিকে শাসকেরা আমলে নিতে চায় নি। ভৌগোলিক সাযুজ্যের বিবেচনায় পরস্পর সন্নিবদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল/প্রদেশের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আবিষ্কার করা গেলেও পূর্ব পাকিস্তান অংশে সেরকম কোনো সম্ভাবনাই ছিলোনা। সুতরাং কেন্দ্রের/পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধনের একমাত্র রশি ছিল ধর্ম। এমন এক নব্য রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় জয়নুল ধর্মীয় বিষয় পরিহার করে তাঁর শিল্প সাধনা চালিয়ে গেছেন। আর এসব কারণে তাঁর ছবির মধ্যে স্থান পেয়েছে এক বিশেষ রকমের রাজনৈতিক ভাষা -যে ভাষার ভেতর বস্তুত প্রকাশ পেয়েছে তীব্র এক মতাদর্শিক ও আদর্শিক অবস্থান। তাঁর সমগ্র কাজ অথবা যে কোনো একটি কাজ "হচ্ছে মতাদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি স্থান (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:৭৯)।" জয়নুল বরাবরই প্রান্তিকের স্বপক্ষে প্রান্তিকের প্রতিনিধি। এই প্রান্ত একদিকে যেমন পূর্ব বঙ্গ তথা পুর্ব পাকিস্তান পশ্চিমের বিপরীতে, তেমনি কৃষি সভ্যতার কারিগড়-কুশীলব কৃষকদের ও অন্যান্য সব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন আখ্যান উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর শিল্প ভাষায় বাংলার প্রান্তকে তুলে ধরেন তারই নিজস্ব কেন্দ্র নগর-মহানগরের বিপরীতে। এ বিবেচনায় জয়নুলের চিত্রমালা গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক চেতনার ইঙ্গিতবাহী। বুলবন ওসমান যেমনটি বলেছেন- "শিল্পতত্ত্ব ও রাজনীতির দৃষ্টিতে তিনি সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর শিল্প ধারা ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের খুব কাছের জিনিস। হয়ত মানবতাবাদীদের একটা পর্যায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। মানসে নিপীড়িতের প্রতি বেদনা তাদের বাস্তবনিষ্ঠ করে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এই শিল্পধারা প্রগতির অনুকূল হয় (ওসমান, ২০০৬:১০৬)।" কেন্দ্র মানে হচ্ছে

এস্টাবলিশমেন্টের অবস্থান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শিক বাস্তবতায় শিল্পী হিসেবে জয়নুলের স্বার্বভৌম মানসচেতনা ও স্বকীয় দৃষ্টি এক দ্বান্দ্বিক শিল্পভাষার মধ্যে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। যে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পের ভেতর দিয়ে ধর্ম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং যে রাষ্ট্রটি তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে তার বিপরীতে জয়নুলের ছবির বিষয় ও অঙ্কনশৈলি এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বার্তা দেয়- যাকে সাহিত্যের পরিভাষায় বলা যায় বাস্তবতাবাদ (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:৬৩)। অনেক অবাস্তবও অনেক সময় স্বাভাবিকের মর্যাদা পায় যেমনটি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে পূর্ব বাংলার যুক্ত হওয়ার বিষয়টি। আবার ইসলামের অজুহাতে কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর এক ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপের ব্যাপারটি। এরকম অজস্র অসংগতিকে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বাভাবিক বলে হাজির করা হয় বা মেনে নেয়া হয় বা মেনে নিতে বাধ্য ও অভ্যস্ত করে তোলা হয়। জয়নুল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি "পাকিস্তান আন্দোলনকে অস্বীকার করেছেন, মুসলিম ফিউডাল অতীত নস্যাৎ করে তিনি বিষয় হিসেবে এনেছেন কৃষকদের, মাঝিমাল্লাদের (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:৩৪)।" তাঁর শিল্পভাষা অন্তত তাই বলে। শিল্প সমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর পাকিস্তানের বাস্তবের থেকে শিল্পী হিসেবে জয়নুল আবেদিনের বাস্তববাদিতার দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌল পার্থক্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরো বলেন-

> "এস্টাবলিশমেন্টের কাছে বাস্তববাদ ছিল স্বাভাবিকতাবাদঃ পাকিস্তান এক স্বাভাবিক বাস্তব, আদি অন্তহীন এক বাস্তব। এই বাস্তবের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক বিষয়ের নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এস্টাবলিশমেন্ট সচেতনভাবে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচার, ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের প্রয়াস শুরু করেছিল। যেন বিষয়ের নির্বাচনটি, ব্যবহারটি পূর্ব-ভাবিত, পূর্ব-সিদ্ধান্তকৃত এবং কাজটির, সাহিত্যটির, শিল্পটির গুরুত্ব নির্ভরশীল সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার ওপর। আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক মুহূর্তটিকে এস্টাবলিশমেন্টের প্রবক্তারা ইসলামি মতাদর্শের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিল। এভাবেই পাকিস্তান এস্টাবলিশমেন্টের প্রবক্তারা ইসলামি মতাদর্শের নামে বাঙালি সমাজ গঠনের বাস্তবতার জটিল নান্দনিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ এবং বিরোধ তৈরিরও চেষ্টা করেছিল, ইসলামি-সংস্কৃতির নামে দেশজ-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য দমন করতে চেয়েছিল (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:৬৫-৬৬)।"

জয়নুল আবেদিন তাঁর শিল্পকর্মে পূর্ববঙ্গকে, বিশেষত তাঁর জনজীবনের বা লোকজীবনের নানান চালচিত্র বিশেষ মহিমায় স্থাপনের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের এস্টাবলিশমেন্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত কোটি রচনা করেছেন যেখানে দেশ মানে পূর্ববঙ্গঃ তার মাটি, মানুষ আর অন্তহীন নিসর্গ। জয়নুলের মানুষেরা ভূমিপুত্র যেমনটি ছিলেন তিনি নিজে। তাঁর মানুষ প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতি সংলগ্ন হয়েই তাদের জীবন পরম্পরা রচিত, আবার সেই প্রকৃতিরই রুদ্ররোষের শিকার সে। তাঁর মানুষেরা নিশ্চই দেশকাল সাপেক্ষ -তারা এই বাংলার মানুষ, তাদের শ্রেণি আছে, সম্প্রদায়ও কখনো কখনো তাদের ধরা পড়ে, কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। আবার, এই মানুষেরাই তাঁর ছবিতে হয়ে ওঠে দেশকালহীন চিরকালের মানুষ - অস্তিত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ, বেঁচে থাকবার তাগিদে শ্রমমগ্ন, প্রকৃতির তির নির্মমতায় পর্যুদস্ত, আবার জীবনের অন্তহীন আহবানে উজ্জীবিত। বিগত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক ছিল পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য, বিশেষত বাঙালি মুসলমানের জন্য একই সঙ্গে জাতিগত আত্মপরিচয় নির্ধারণের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের কাল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকে চলমান কৃষিপ্রধান পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকতা '৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান জমানায় আরো ত্বরান্বিত হয় এবং জনমানসে তা আরো বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। একথা ভুলে গেলে চলেনা যে, কেন্দ্র-পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

প্রান্ত-পূর্ব পাকিস্তানের যে জন অসন্তোষ ও জনরোষ তার প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ধরা দিয়েছিল সেখানের মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যে রাজনৈতিক প্রশ্নটি ছুড়ে দেয়া হয় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তা হচ্ছে- সোনার বাংলা শ্মশান কেন? বস্তুত ওই প্রশ্ন ছিল শোষিত জনগোষ্ঠীর পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিপ্রকাশ। মুজিব প্রণীত ও পেশকৃত ঐতিহাসিক ছয়দফা'র মূলকথা ছিল পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক মুক্তি। স্বভাবগত ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও জয়নুলের শিল্পকর্মে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জাতিগত নয়া জিজ্ঞাসা ও জাগরণের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তবে শিল্পীর ভাষাতেই তিনি তাঁর স্বদেশের রাজনৈতিক আকাংখাকে তুলে ধরেছেন। জয়নুলের যে দুটি বড়ো কাজ পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে

মনপুরা ■ জয়নুল আবেদিন ■ ১৯৭০

সম্পৃক্ত করে দেখা হয় তার একটি হচ্ছে 'নবান্ন' (১৯৬৯) এবং অন্যটি 'মনপুরা' (১৯৭০)। দুটি কাজই তাঁর দীর্ঘ পরিসরের- 'নবান্ন' ৬৫ ফুট এবং 'মনপুরা' ৩০ ফুট। জমিনের এই দৈর্ঘ্য ছবির অন্তর্গত বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কেননা দুটি ছবিতেই তিনি উপজীব্য করেছেন পূর্ব বঙ্গের মানুষের সমন্বিত জীবনের কাহিনী। প্রথমটিতে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং দ্বিতীয়টিতে প্রকৃতির রুদ্ররোষের কাছে পর্যুদস্ত বাঙালির অসহায়তা ধরা হয়েছে। কিন্তু এ দুটি ছবিই পূর্ব পাকিস্তানে সমসাময়িক রাজনীতির মধ্যিখানে স্থাপিত। জয়নুল দীর্ঘ পরিসরের 'নবান্ন' স্ক্রলটি আঁকেন ১৯৬৯ সালে "যখন বাঙালির স্বাধীকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছে (হোসেন, ২০১৬:২১০)।" বাংলাদেশের ইতিহাসে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কেননা ওই অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশের মানুষের জাতিগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের শক্তিমত্তার বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রতিভাত হয়। জয়নুলের নবান্নে মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতিসত্তাগত আত্মপরিচয়ের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে চিত্রিত হয়। নবান্ন স্ক্রলটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে 'নবান্ন-১৩৭৬' শিরোনামে যে গোষ্ঠী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাঁর থিম বা শিরোনাম হিসেবে। (মতলুব আলীর জয়নুল বিবেচন, ৭৬-৭৭)। নবান্ন-পূর্ব জয়নুলের স্বদেশকে তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় খন্ড খন্ড রূপে -জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে তিনি ধরেছেন বিচিত্র রূপে; কিন্তু নবান্নে তিনি হাজির করেন সমগ্র বাংলাকে -কৃষিপ্রধান পূর্ববঙ্গের মানুষের লোকজীবনের এক পরিপূর্ণ ছবি।

"এর ভেতর দিয়ে পূর্ববঙ্গের জনজীবনের সমস্ত দিক তিনি তুলে ধরেন। বাংলার প্রকৃতি, বাঙালির লোকাচার, নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বেঁচে থাকা-সমস্তই তিনি তুলে ধরেন এ ছবিতে। তাঁর দেশাত্মবোধ ও আঙ্গিক-ভাবনার মহাকাব্যিক প্রকাশ ঘটে এখানে (ঘোষ, ২০১৬:১৭৫)।" উনসত্তর-সত্তরে বাঙালির জনমানসে উদ্দীপ্ত সাংস্কৃতিক চেতনার প্রেক্ষিতে জয়নুলের ঐ ছবি ও তার প্রদর্শনী এক তীব্র রাজনৈতিক দ্যোতনা লাভ করে। ননান্ন'-তে তিনি বিধৃত করেন এই বাংলার/বাংলাদেশের গণমানুষের, বিশেষত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের এক আদ্যপান্ত উপাখ্যান- সে জীবনের সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-আকাংখা-আয়োজন। এ এক চিরায়ত বাংলার মহাকাব্যিক বয়ান। নবান্নে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বক্তব্য এড়িয়ে গেলেন বটে কিন্তু যে সংস্কৃতির ছবি তিনি চিত্রিত করলেন সমকালের প্রেক্ষিতে তাতে দর্শকের কাছে ঐ রাজনীতিটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কেননা এ ছবি বাঙালির ধর্ম নিরপেক্ষ

ঐতিহ্যের বাণীটিকে উচ্চকিত করে তোলে, যে বাণীর মর্মরধ্বনি তখন পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও জনমানসে প্রবলভাবে অনুরণিত। প্রদর্শনীতে জয়নুল আগত দর্শকদেরকেও যুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁর ছবির জমিনে তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যম। নিজেও যুক্ত হয়েছিলে জনতার সঙ্গে। শিল্পের জন্য শিল্প নয়, শিল্প জনতার জন্য এবং জনমানুষকে নিয়ে-এমন একটি শিল্প দর্শন তাঁকে এই অভিনব পন্থা গ্রহণে প্রাণিত করেছিল বলে মনে হয়। কেননা আবেদিনের শিল্পবিশ্বাসের কথাটি মনে রাখলে এ অনুমান অযথার্থ মনে হবেনা। "শিল্পকলা শুধু শিল্পকলার জন্য'- এ ধরনের বিশ্বাস আমার নয়। আমি বিশ্বাস করি শিল্পকলা মানুষের জন্য- তার জীবনকে সুঠাম ও সুন্দর করার জন্য (ইসলাম, ২০০৬:৭২)।" এভাবে ছবির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সরাসরি সম্পৃক্ত করে "বাঙালি জাতির মহা ঐক্যের কালে রচিত চিত্রকর্মটিকে তিনি ঐক্যের দলিলে পরিণত করেন" (হোসেন, ২০১৬:২১০)। আর 'মনপুরা-৭০' ছবিটির পটভূমিতে থাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনাঃ সত্তরের নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় যার ছোবলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকবর্গ দুর্যোগ কবলিত পূর্ব বঙ্গীয় মানুষের প্রতি ঔদাসিন্য আর অবহেলার চরম প্রদর্শন করে। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল শাসকের নির্দয়তা। জনদরদী জয়নুলের মন স্বদেশবাসীর সেই দুর্ভোগে কেঁদে ওঠে। রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েও তার বাসিন্দারা সে রাষ্ট্রের সুবিধা বঞ্চিত। মনপুরা সমগ্র পূর্ববঙ্গেরই প্রতিরূপ হয়ে ওঠে যেন জয়নুলের ছবিতে। ঝড় আর জলোচ্ছাসে মানুষের ঘরবাড়ি তছনছ হয়, গরু-মোষ ইত্যাদি সহ অজস্র মানুষের অসহায় মৃত্যু হয়; পূর্ব বঙ্গের মানুষের জীবনে নেমে আসে মহা বিপর্যয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় রাষ্ট্রের অমানবিক আচরণ ঘটিত বিপন্নতা। মৃত্যু আর লাশের কাতারে মিশে যায় মানুষ আর গবাদি পশু। এই মানুষেরা যেন রাষ্ট্রহীন; পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন বাস্তবতায় রাষ্ট্র তার জনগণের দুর্ভোগের ভাগীদার নয়, সে তার স্রষ্টা ও সহযোগী। "আবেদিনের মনপুরা কৃষকের, পাকিস্তানী বাংলাদেশের অবস্থা আমাদের চোখে উন্মোচিত করে (জাহাঙ্গীর, ২০১৬:২৪৪)।" জয়নুলের স্বদেশ ও সমকাল চেতনার এ দুই প্রধান শিল্পকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করে আবুল মনসুর লিখেছেন-

> "জয়নুল এ ভূমিপুত্র পল্লীবাসীকে রুপায়িত করেছেন নিসর্গলগ্ন করে, তাকে বেষ্টন করে থাকা নিসর্গের সঙ্গে অবিরাম সহাবস্থান ও সংঘর্ষের মধ্যে। নিসর্গের সঙ্গে মানবের অধুনা-বিরল এ দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের এক পুনর্নির্মাণ যেন রচিত হয় 'নবান্ন' স্ক্রলচিত্রে। ঊনসত্তরের গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায়-চিহ্নহীন বাঙালিজীবনের আনুপুর্বিক এক বয়ান উপস্থাপন করে গণজাগরণের চেতনার সমান্তরাল বোধকে বিবৃত করেন তিনি, অস্বীকার করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিশ্বাসের ভিত্তিকে। একইভাবে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবার্তায় বিধ্বস্ত মনপুরার ভেদাভেদ-লুপ্ত মৃতের স্তুপ যেমন আঘাত হানে সম্প্রদায় পরিচয়ের বিভাজন-বিশ্বাসে, উন্মোচন করে দেয় শোষকের ভন্ডামির রূপ, তেমনি মৃতের উত্থিত হাতের ভঙ্গিতে যেন প্রতিকায়িত হয়ে ওঠে প্রত্যাঘাতের প্রতিজ্ঞা। স্ক্রলচিত্রটির সর্বশেষ প্রান্তে একটিমাত্র জীবিত মানুষ যেন সকল ধ্বংসের বিপরীতে জীবনের জয়গান, অপরাজেয় মানবের পুনরুত্থানের বার্তাবাহী। এ দুটি শিল্পকর্মে জয়নুল শুধু রাজনৈতিক অবস্থানকেই প্রতিভাত করেন না, বাংলার জড়ানো পটের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বক্তব্যকে বর্ণনাত্মক বা ন্যারেটিভ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে দেশজ সংস্কৃতির শেকড়ের সঙ্গেও একাত্মতা জ্ঞাপন করেন (মনসুর, ২০১৩:৪৫)।"

জয়নুল আবেদিনের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রতি বরাবরই এক ধরনের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এজন্য তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসীদের দ্বারা সমালোচনার শিকার হয়েছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকের বাংলায় বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল আর সৃষ্টিশীল। সমালোচকদের মধ্যে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী আবেদিনের কোনো কোনো ছাত্রও ছিলেন। কিন্তু জয়নুলের

ছবি তো রাজনীতির কথাই বলে -শিল্পের ভাষায়। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে দেশের কথা বলাই ছিলো রাজনীতির কথা বলা। শিল্পী জয়নুলকে রাজনীতিবিমুখ হিসেবে অভিহিত করলেও তাঁর শিল্পকে তো রাজনীতিহীন বলা যায় না। স্বদেশের প্রতি সুগভীর আর অকৃত্রিম অনুরাগই জয়নুলের শিল্প-রাজনীতির মূলকথা। কেন্দ্র নয়, প্রান্ত; নগর নয়, নিসর্গ; বুর্জোয়া রুচি নয়, লোকায়ত সংস্কৃতি; সাম্প্রদায়িকতা নয়, মানবতা -মূলত এই হচ্ছে জয়নুলের ছবির আঁধার ও আধেয়। বৃটিশ ও পাকিস্তানী বাংলা ও পূর্ববঙ্গের বাস্তবতায় কৃত জয়নুলের ছবির সেসব লক্ষ্মণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলীকে কোনোভাবেই রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা বা হাজির করা সম্ভব হয়না। হয়না তার কারণ তাঁর ছবির পটভূমিতে মিশে রয়েছে সময় ও ইতিহাস যা রাজনীতির মধ্যে প্রবিষ্ট। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জয়নুলের কাজের মর্মগত সম্পর্ক অনুসন্ধান করে আবুল মনসুর বলেন- "পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের ভেদনীতির বিরুদ্ধে জয়নুল আবেদিন একজন শিল্পীর অবস্থান থেকে কীভাবে প্রতিরোধের একটি প্রতীকী অথচ শক্তিদৃপ্ত রূপকল্প নির্মাণ করেন সেটি লক্ষ্যণীয়। তাঁর প্রতিরোধের অস্ত্র প্রথমত এবং প্রধানত বিষয়বস্তু। জয়নুল তাঁর বিষয়ের কেন্দ্রে স্থাপন করেন পল্লির সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গীয় মানুষকে। পাকিস্তানের সূচনালগ্নে, ১৯৫১ সালেই, ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিবাদী রাজনৈতিক মৌতাতের আড়ালে পুঁজিবাদী শোষণের ভন্ডামিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন সম্প্রদায়-চিহ্নহীন কর্মিষ্ঠ অন্তজ মানুষের মনুমেন্টাল ও মানবিক উপস্থাপনার মাধ্যমে (মনসুর, ২০১৬:১৮৩-১৮৪)।" রাজনীতির শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনে বারে বারে তাঁকে কেন্দ্রাভিমূখী হতে হয়েছে, কিন্তু বারে বারেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন প্রান্তে এবং আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন প্রান্তকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলবার। পাকিস্তান সরকারের সম্প্রচার বিভাগে চাকুরি নিয়ে করাচি গিয়েছেন বটে, কিন্তু বছর ঘুরতেই ফিরে এসছেন ঢাকায়, ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রতিষ্ঠান গড়বার কাজে। পঞ্চাশ-ষাট দশকে তিনি কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯৫১-তে লন্ডন যান সেখানের স্লেড স্কুল অব আর্টস-এ শিল্পশিক্ষা নিতে। পাশ্চাত্যের শিল্পশিক্ষা তাঁকে মোহিত করেনি। বরং ১৯৫২-তে দেশে ফিরে তিনি আরো বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি (হোসেন, ২০১৬:২০৮)। '৫১-তে কৃত তাঁর কাজগুলোর দিকে চোখ ফেরালে তো লোকায়ত পূর্ববাংলা ও তার অন্তস্থিত জীবন ও জীবন সংগ্রাম বৈ কিছু চোখে পড়েনা। এ পর্বের দুটি কাজ, যথা-'বিদ্রোহী' ও 'মই দেওয়া'র ভেতর কৃষিভিত্তিক বাঙালি জীবনের ভেতরকার দ্রোহ ও শ্রমসুন্দর কর্ষণের নিপুনতা ও আনন্দের একেবারে মৌল রূপটি ধরা পড়ে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি (৫৬-৫৭) তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও স্পেন যান। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সেসব অভিজ্ঞতা তাঁর স্বদেশকেন্দ্রিক নিজস্ব শিল্পবোধ ও শিল্পদর্শন-কে শানিত করেছে মাত্র; তাঁর আস্থা আরো দৃঢ় হয়েছে (ঘোষ, ২০১৬:১৭৩)।

একথা ঠিক যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জয়নুলের উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ প্রায় গোচরে আসেনা বললেই চলে (চৌধুরী, ২০১৬:১২৬)। তবু প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিমুখ হওয়া সত্বেও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের দামামা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী কোনো বাঙালির পক্ষেই, তা তিনি যতোই রাজনীতি বিমুখ হোন না কেন, তা সম্ভব ছিলো না। একাত্তরপূর্বকাল থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন পেরিয়ে সমগ্র যুদ্ধকাল জুড়ে বাংলাদেশের চারুশিল্পীরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবিষ্ট হয়েছিল এ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকার চারুকলা ছিল সে যুদ্ধের অন্যতম অংশীদার। কাজেই বাঙালি সংস্কৃতির একজন অবিসংবাদিত কারিগড় হিসেবে সে যুদ্ধ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই। একথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম ধর্মীয় একটি প্রবল স্রোতের মুখ সৃষ্ট পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্রে চারুশিল্প চর্চার উদ্দেশ্যে জয়নুলের উদযোগেই

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় জয়নুল ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। একথা ঠিক যে রাষ্ট্রের সহযোগীতা নিয়েই তিনি তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান-পূর্বকালে অর্জিত জয়নুলের বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে যেমন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সহসাই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, তেমনি জয়নুলও তাঁর খ্যাতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন পূর্ব বাংলায় চারুকলার মতো দৃশ্য-সস্কৃতির একটি মননশীল-সৃজনীধর্মী প্রতিষ্ঠান তৈরিতে। স্বাধীনতাযুদ্ধ কালে তাঁরই ছাত্ররা নানা মাত্রিক পোষ্টার ফেস্টুন এঁকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শানিত করেছেন। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি জয়নুলের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিবাদ তুঙ্গ স্পর্শ করে তাঁকে দেয়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ খেতাব 'হেলাল-ই-ইমতিয়াজ' বর্জনের ভেতর দিয়ে। কাজটি তিনি করেছিলেন জনগণকে সামনে রেখে, ময়মনসিংহের বিশাল এক জনসভায় (আলী, ২০১৬:১৯৬)। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচারে-প্রসারে যেসকল একাডেমিক বুদ্ধিজীবী ষাটের দশক থেকে তৎপর ছিলেন জয়নুল তাঁদেরই সহযাত্রী। ওই দশকেই পাকিস্তানের বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত সম্প্রচারের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তাঁর বিরুদ্ধে যে ১৯ জন বুদ্ধিজীবী প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করেছিলেন জয়নুল আবেদিনও ছিলেন তাঁদেও মধ্যে একজন (আনিসুজ্জামান, ২০১৬:৬৭)। আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে ঢাকার রাজপথে প্রতিবাদী মিছিলের 'শিল্পীত সঙ্গী' করে গণমানুষের প্রাণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যে চারুশিল্পীসমাজ জয়নুল ছিলেন তাদের প্রেরণা (আলী, ২০০৬:১৩২)। পাকিস্তানের শাসকেরা তাঁকে যতোই সম্মান-স্বীকৃতি দিকনা কেন তিনি যে তাদের আদর্শের জন্য বিপজ্জনক ছিলেন সেটা তারা বুঝতে ভুল করেনি। বিষয়টি পরিষ্কার হয় এই ঘটনার ভেতর দিয়ে যে পঁচিশ মার্চের গণহত্যার একদিন পরেই পাক সেনারা সাতাশ মার্চ জয়নুলের খোঁজে পুরান ঢাকায় তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। জনৈক শুভাকাঙ্খী তাঁকে আগে ভাগে সতর্ক না করলে এবং তিনি তরিঘড়ি বাড়ি না ছাড়লে হয়তো তাঁকে সেদিনই প্রাণ দিতে হতো (ওসমান, ২০০৬:৯৬)!

উপসংহার :

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সমগ্র জীবনের শিল্প সাধনার কেন্দ্রে ছিল তাঁর স্বদেশ ও সমকাল। স্বদেশকে আশ্রয় ও উপজীব্য করে সমকালের প্রেক্ষাপটে তিনি ছবি এঁকেছেন, স্বদেশ ও সমকালকে রচনা করেছেন অন্তরের গভীর অনুরাগে। রাষ্ট্র ভেঙ্গে রাষ্ট্র গড়েছে, কিন্তু জয়নুলের স্বদেশ চিরকালই রয়ে গেছে এই বাংলা, বাংলাদেশ। রঙ আর তুলিতে বাংলার গান গেয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর স্বদেশ বিশ্বের কথাও বলে, কেননা যে মানুষ আর নিসর্গের অবয়ব ও অন্তরকে তিনি বাঙময় করেছেন ছবিতে সেসব দেশকাল সাপেক্ষ হওয়া সত্বেও মানুষ ও প্রকৃতির এক নিরপেক্ষ সত্বার স্মারক হয়ে ওঠে। গ্রামীণ জীবন ও লোক ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে জয়নুল নিজেই হয়ে ওঠেন আধুনিক কালের এক বিশিষ্ট লোকশিল্পী। দারিদ্রপীড়িত, শোষিত ও বিপন্ন মানুষের প্রতি তাঁর নৈর্বক্তিক অন্তরপীড়া তাঁকে করে তোলে বিশ্বমানবিক। সমাজ-সমকাল-নিসর্গের বাস্তবপন্থী রূপায়নের যে স্বাতন্ত্র তাঁর ছবির ভাষা ও শৈলিকে বিশেষত্ব দিয়েছে, করে তুলেছে জয়নুলীয়, তাঁর পশ্চাতে কাজ করেছে এক গভীর জীবন দর্শন -যার নাম মানবতাবাদ। জয়নুলের স্বদেশ ও সমকাল অন্বেষা তাই আমাদের কাছে এক সর্বজনীন জীবন দর্শনরূপে ধরা দেয়।

তথ্যসূত্র :

আতিকুল্লাহ, সাইয়িদ (২০১৬) *"শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

আনিসুজ্জামান (২০১৬) *"জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

আলী, মতলুব (২০০৪) *"মতলুব আলীর আবেদিন বিবেচন"*, ঢাকা : রূপ প্রকাশন

আলী, মতলুব (২০০৬) *"বকুলতলার জয়নুল আবেদিন"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

আলী, মতলুব (২০১৬) *"জয়নুল আবেদিনের বাংলাদেশ সাধনা"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

আহমেদ, জালালউদ্দিন, বড়ুয়া, সুব্রত (অনুদিত, ২০১৬), *"জয়নুল আবেদিন"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

ইসলাম, নজরুল (২০০৬) *"শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল (২০০৬) *"শিল্পী ও অধ্যক্ষ থেকে শিল্পাচার্য"* শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল (২০০৬) *"জয়নুল আবেদিন ও বাংলাদেশের শিল্পচর্চার পঞ্চাশ বছর"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

ওসমান, বুলবন (২০০৬) *"জয়নুলের স্বপ্ন"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

ওসমান, বুলবন (২০০৬) *"শিল্পাচার্যের ছবি ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জন দেয়া হোক"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ (২০১৬) *"জয়নুল আবেদিনঃ স্ববিরোধী ধারণার বলি"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

ঘোষ, মৃণাল (২০১৬) *"দেশাত্মবোধের বিশ্বগত রূপ"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

চৌধুরী, বিজন (২০১৬) *"আমার দেখা জয়নুল আবেদিন"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (২০১৬) *"জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা"*, ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস

মকসুদ, সৈয়দ আবুল (২০০৬) *"শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

মনসুর, আবুল (২০১৩) *"জয়নুল আবেদিন"*, ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৬) *"জয়নুল আবেদিনের শিল্প ও শিল্পচেতনা"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

হোসেন, নিসার (২০১৬) *"জয়নুল আবেদিন"*, জয়নুল আবেদিনঃ জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক) ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস

হোসেন, নিসার (২০০৬) *"জয়নুল ও তাঁর সমকালীন শিল্পীরা"*, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

Khan, Akbar Ali (1996) *Discovery of Bangladesh: Explorations into Dynamics of a Hidden Nation,* Dhaka : University Press Limited

[**Abstract:** Artist does not have any country; though such words may be pronounced as the ethos of a universal ideology and philosophy of art; yet it cannot be denied that as a social being, the artist too is not out of a particular geo-territorial identity. This is because as human birth and upbringing happen within the boundary of a specific society and culture. Everybody's life is determined by a time frame. But man transcends the limit of location and overflows the boundary of time through the process of development and progression of his talent and mind. It is made possible not to exclude the location and the time he belongs to; instead, he becomes universal by cherishing all those matters. Because the basic identity of an artist, that is 'man', is predominantly rooted in the very depth and breadth of the culture and territory of his contemporary times.

A salient feature of the artworks of the art maestro Jaynul Abedin is their contiguousness with the homeland and with contemporary times. Abedin is an unavoidable art personality in the history of the fine arts of this Indian subcontinent or Bengal. Because he sought a means of success not only by mingling himself in the stream of his native art tradition, he added to enrich that tradition through the uniqueness of his creative imagination. States had fallen apart to be rebuilt again, and various contending currents- calculations of politics divided the society people variously –sometimes based on community and sometimes by territorial demarcation. Sometimes, the adversity of nature joined the rulers to increase the misery of man. All these touched Jayul Abedin with a deep human sensitivity. He was born in the eastern part of the undivided Bengal: in Kishorganj of greater Mymensing. He was educated in Calcutta, the then capital of British India. His birth time identity is an Indian Bengali; no doubt, he accepted too that tradition in his art schooling. But within the Indian art tradition, Jaynul becomes aware of the Bengali art tradition and he adds newness to that. There are both parts of Bengal, western Calcutta and eastern Dhaka mingled in the greater territorial society and culture of which he is a successor. Therefore, he is of both the parts of Bengal in the classical realization of his artistic creative imagination, which can be territory-freely identified as the folk.

Jaynul Abedin took his schooling in art under the influences of the great iconic personalities of the Calcutta-centered Indian cum Bengali fine arts tradition like Abanindranath Thakur, Nandalal Basu, Zamini Roy, Rabindranath Thakur, etc. There was a trend of mingling the East and the West strongly active in that tradition. The basic characteristic feature of the Calcutta-centered Indian cum Bengali art tradition was contiguous with urban life and sensation. To that European modernity-influenced art tradition of Bengal, Jayniu added a new trend influenced by Bengali folk life. The provenance of that stream/tradition was East Bengal, which was renamed later as Bangladesh. The gravitational center of his art thought is of Bengal, particularly of the rural society and its working-class people of east Bengal. It drove him towards a down-to-earth realization of real life instead of a surrealistic and romantic imagination of that. The most brilliant witness to this is his Famine Series of Drawings done during the Calcutta phase of his life (1933-1947).

Jaynul Abedin was a humanitarian witness to his contemporary times. The main subject matter of his artworks is man, particularly the marginalized and the torn-ups. His drawings and paintings have been witnesses to history and its narration at the same time. They are sometimes the narrative of culture. He was a socialist in the all-humanitarian realization of a real artiste despite his being not any avowed supporter cum follower of any particular political party of ideology. The sole objective of his art ideology was the collective

development and progress of society, not of the personal. All through the forms and contents of his famine series of drawings is revealed his great-hearted human self on the one hand, and on the other, those indicate, at the same time, his roots-adherence. As a consequence of the geopolitical convulsion, though Jaynul happened to be a citizen of the theocratic state of Pakistan in 1948, in his consciousness, he remained embraced with the idea of a secular folk life based on the Bengali culture. The main foundational basis of this idea is this east Bengal-Bangladesh. Jaynul kept himself engaged in his artistic creation, being one with the joint current of politics and culture of the Bengalis at different bends of a 24-year-long history of their movement for self-determination and independence. The artwork titled *'Nabanna'* (The Festival of New Food-grain) in perspective of the mass uprising of 1969, The *Monpura'70* (named after the island Monpura most devastated in the storm) in perspective of the devastating tornado in 1970, and the *Bir Muktijoddha* (The Valiant Freedom Fighter) sketched in perspective of the historic Liberation War of 1971 bear witness to his consciousness of his mother country and the contemporary times.]